পদক্ষেপ

বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনা

১৯৯৬

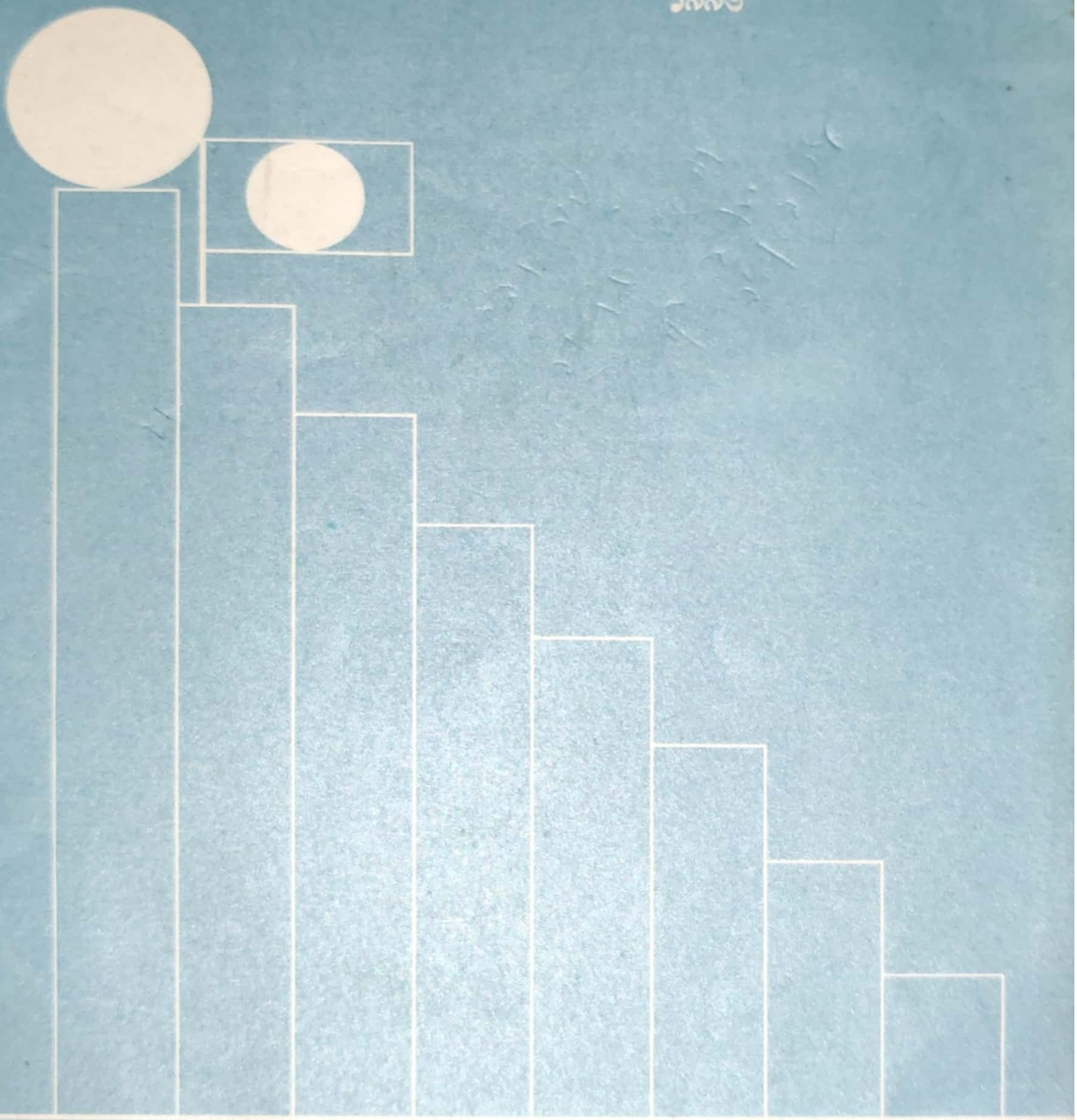

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর

ছাতক, সুনামগঞ্জ।

CamScanner

পদক্ষেপ

বিজয়ের রজতজয়ন্তী স্মারক প্রকাশনা '৯৬

যুগ্ম সম্পাদনায় ঃ হেলাল আহমদ চৌধুরী
মোঃ জহিরুল হক
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ অধ্যক্ষ আখলাকুর রহমান

CS CamScanner

'যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে'–তাঁদের উদ্দেশ্যে।

প্রকাশকাল ঃ ষোল ডিসেম্বর উনিশ শ' ছিয়ান্নব্বই

অক্ষর বিন্যাস ঃ নাজমুল হক নাজু

মুদ্রণ ঃ মাহমুদ কম্পিউটার
পূর্বজিন্দাবাজার, সিলেট।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী পবিত্র কুমার দেব

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ বাংলাদেশ বিশ টাকা
যুক্তরাজ্যে দুই পাউন্ট

CamScanner

✓বিচ্যুতি-অপারগতা

❑'পদক্ষেপ' বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। 'ছাপাখানার ভূত'কে হয়তোবা ঘাড় থেকে নামাতে পারিনি। এ জন্যে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

❑ প্রচুর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র পরিসরের কারণে উক্ত প্রকাশনায় অনেকের লেখা সংযোজন করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত।

CamScanner

একাত্তর কথা ঃ বারবার করে বলা

মোঃ আখলাকুর রহমান

অধ্যক্ষ, জনতা মহাবিদ্যালয়, মঙ্গনপুর।

ধর্মের নামে একটা কৃত্রিম রাষ্ট্রের আনুগত্য ছিন্ন করেছিলো একাত্তর সালের বাংলাদেশের মানুষ।

একাত্তর সালের বাংলাদেশ। আর দেশ কালের পটভূমিতে সে সময়ের মানুষেরা। সারাদেশ ব্যাপী শত-সহস্র-লক্ষ কণ্ঠে মাতৃভূমির জয় ঘোষনা, গগন বিদারী ধ্বনি, প্রতিধ্বনি 'জয় বাংলা'। আমরা মাতৃভুমি বাংলার জয় ঘোষণা করি। ডাক আসে মুক্তির, স্বাধীনতার, সংগ্রামের। বজ্রকণ্ঠের কালজয়ী উচ্চারণ 'এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম-মুক্তির সংগ্রম।'

জিন্দাবাদ থেকে কেনো বাংলায় জয়ধ্বনি? পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ? একাত্তর পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরের ঘটনাক্রমগুলোই এর জবাব দেবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আর গণতন্ত্রহীন নৈরাজ্যে যেনো দম বন্ধ হয়ে আসছিলো আমাদের। অন্যায় অবিচারের লাগ-ামহীন ব্যপ্তি, শোষণের যাঁতকলে ক্ষীণপ্রান জনতা। যেনো যাদুর ছোঁয়ায় শত তেজোদ্দীপ্ত হয়ে প্রবল ও সমুদ্রোচ্ছাস তল্য আবেগের প্লাবনে সৃষ্টি হলো আত্মোৎসর্গের এক অভূতপুর্ব অধ্যায়।

একাত্তরের বাংলাদেশের মানুষেরা। আমি আমাদের মুক্তি যুদ্ধের সেই অগ্নিঝরা, উম্মাতাল দিন গুলোতে আপনাদের প্রত্যাবর্তন করার আহবান জানাই।

একাত্তরের বাংলাদেশ।গোটা দেশটাই যখন এক রণাঙ্গন। ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ, সবাই অস্ত্র হাতে-রাণক্ষেত্রে। প্রত্যেকটি বাঙালী এক একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা। এই প্রথম একই অংগীকারে, শংকাহীন লক্ষ কোটি প্রাণের, বজ্রশপথ আর আত্মত্যাগে-আমাদের শ্রেষ্ট অর্জনের ইতিহাস। সমস্ত জনতার হৃদয়ের গভীর থেকে প্রত্যয়জাত মাতৃভুমির স্বাধীনতা, স্বদেশের সীমানা থেকে শত্রুদের বিতাড়ন আর কেবলই আত্ম পরিচয়ের উৎসের সন্ধান। বাংলাদেশ, বাঙালী; সাত কোটি বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ। কার সাধ্য রোধ করে জনতার অভিযাত্রা।

আমি সকলকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই আপন ইতিহাস থেকে বার বার সুচীমুখ প্রেরণা আহরণের অনুরোধ জনাই।

ব্যতিক্রমের কথা বলবো? অবশ্যই ছিলো। সকল বিবেচনায়ই যখন এই মাত কোটি মানু-ষের সর্বস্তরে মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে প্রচন্ড আকাঙ্খা ও বিশ্বাসবোধ এককভাবে সক্রিয়। দেউলিয়া মানসিকতায় আচ্ছন্ন ক'তেক লোভী নরপশুর মুর্খতা ও অর্বাচীন সিদ্ধান্তে মুক্তির যুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হলো প্রচুর। সেদিন এ দুর্জনেরা হানাদরদের সাথে আতাঁত করে বাধাঁ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। জাতির বিকাশমান গণতান্ত্রিক চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা নীল নকশায় নানা উপকরণের সমন্বয় ঘটাতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে এ দুমুখেরা। তাবৎ মানবিক মল্য বোধ। রাষ্ট্র, সমাজ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে একাত্তরের বাংলাদেশে সংঘটিত হয়

ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড। হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ সহ সব ধরণের পাশবিক নির্যাতনের অবাধ ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব ছিলো, এ বিশ্বাস ঘাতকদের। এরা জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, মীর জাফর আলী খাঁ আর এজিদের সুযোগ্য উত্তরসুরী। খুব সহজেই সহায় ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা আর আড়া আড়ি পথে ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় অবস্থানের স্বপ্নে বিভোর ছিলো এরা।

অস্ত্র কোন মুখ্য উপকরণ ছিলো না। সত্য ন্যায়ের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসাই একাত্তরে এক মহৎ অর্জনের ঘাটনাকে দ্রুত সম্ভব করে তুলেছিলো। অগ্নিস্ফুলিংগের ন্যায় বিচ্ছুরিত কাঙালীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানেরা খুব সহসাই সশস্ত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে কার্যকার প্রতিরোধ গড়ে তুলে। মাত্র ন'মাসের মাথায় ধলোয় মিশে যায় হানাদারদের দুভেদ্য দুর্গ। নিলর্জ্জ কাপুরুষোচিতয় সকল সহযোগী সহ হিংস্র হায়েনারা খুব অল্প সময়েরই ধসে পড়ে।

একাত্তরে বাঙালীরা অপ্রতিরোধ্য গতিধারা মুক্তিকামী বিশ্ব ও মানুষের কাছে ছিলো এক অনন্য, অবিস্মরণয়ি দৃষ্টান্তের অধিক। আর্ন্তজাতিক কুচক্রীরা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে হানাদারদের পক্ষ নিয়েছেলো। তাদের চরম ভাবে হতাশ হতে হয়েছে। একাত্তরের এ নিদারুন দুঃখবোধ পরে রূপান্তরিত হয় ঈর্ষায়। বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেওকষ ও দ্রুত পুনরুত্থান রোধে যার পর নাই মরিয়া হয়ে উঠে তারা। এক. পরাজিত মিত্রদের উত্থান এবং দুই. নানা মেকানিজমে বাঙালী জাতির দ্বিধা বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয়া। এ দু'টোই ছিলো প্রথম কাজ। রাজনীতি, অর্থনীতি ও কুটনীতির চাপ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদের আর্ন্তজাতিক মিত্রজোট সম্ভব সকল অপকৌশলই প্রয়োগ করে একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে।

দুভার্গ্য বাঙালির। দুভার্গ্য একাত্তরের বাংলাদেশে গৌরব ময় অর্জনের ইতিহাস সৃষ্টিকারী সাতকোটি মানুষের। শঠতার ফাঁদে খুব সহজেই পা দেয় শত শত মুক্তিযোদ্ধা সহ অগণিত স্বজনেরা। ফলে স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই জাতীয়তাবাদের চেতনা ভিত্তিক শত্রু মিত্র নির্ণয়ের প্রাথমিক কাজটুকু শুরু করা সম্ভব হলো না। যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিলো, জাতীয় ঐক্য নিশ্চিদ্র রেখেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুসংহত করে ক্রমাগত কেবল এগিয়ে যাওয়া। গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিকতা দানের লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে কেবল সহায় সম্পদ লাভর অসম প্রতিযোগিতা এমন কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের অন্ধমোহ আস্থান্ন করলো অনেককেই। পর্যায়ক্রমিক উত্তরণের বাস্তব ভিত্তি গুলোকে অপ্রয়োজনীয় চিহ্নিত করে কার্টকার্ট পথে প্রাচুর্য্য লাভের স্বপ্ন দেখানোর মতো বহুরূপী যাদুমন্ত্র উচ্চারিত হলো মুক্তিপাগল তারুণ্যের সামনে। এমন একটা সময় যখন উন্নয়ন অগ্রগতির জন্যে সবাই ব্যাকুল। অস্থির জনতা যা-ই ভালো, কেবল তা-ই শুনতে চায়। ভালো কিছু অর্জন এবং সমৃদ্ধির জন্যে জীবন বাজী রেখে সবাই যখন রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো।

শাপে বর হলো বৈরী শক্তির। খুব একটা আত্মগোপন থাকার প্রয়োজন হলো না তাদের। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান গণতন্ত্রের স্থলে কল্পিত বিপ্লব প্রতিস্থাপনের প্রয়াস এর এ লক্ষ্যে মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদের একাংশের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে লাগাতার সাঁড়াশি অভিযান স্বাধীনতা বিরোধীদের জন্যে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দেয়। তারাও তখন নানা সহায়ক কার্যক্রমে অংশ নেয়। প্রথম প্রথম কিছুটা আড়ালে আবডালে থেকে হাজারো রকম

অপপ্রচার চালানোই ছিলো তাদের কাজ। এর পর প্রকাশ্যেই।

একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশ। বাস্তব দিক হচ্ছে, একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অর্থনীতি। শিল্প, যোগাযোগ সহ সবর্ত্র চরম দুর্দশা। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের করুণ আর্তনাদ। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই স্বজন হারাসোর আহাজারি।

প্রয়োজন ছিলো আত্ম নিবেদনের। অদম্য সাহস, নিখাঁদ আন্তরিকতা নিয়ে পর্ণ গঠন প্রক্রিয়ায় সর্বশক্তি নিয়োগের। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সত্য ও ন্যায়ের আহব সৃষ্টি করে গনতন্ত্রায়নের মাধমে একটা সিভিল ও সেক্যুলার সমাজ প্রতিষ্টার লক্ষ্যে দ্রুত কাজ করা অপরিহার্য ছিলো। সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সব কিছু এলো মেলো করে দেয়। দেশ মাটি ও মানুষ নিয়ে যেনো আর কোনো ভাবনাই অবশিষ্ট থাকলোনা অনেকের কাছে।

আমি রাজনীতির কথা বলছি। রাজনৈতিক বিশৃংখলাই একত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিপদজনক করে তুলে। নবজাত একটা শিশু রাষ্ট্রের পূর্ণ গঠন পরিচর্যায় সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা যখন ছিলো খুবই জরুরী। ক্ষমতাসীনদের ভুল এবং অন্যায় পদক্ষেপ গুলোকে উদার দৃষ্ট ভঙ্গি দিয়ে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিলো যাদেরআর নিলেন বিপরীত কৌশল। চোরকে ডাকাত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নেতিবাচক ধারায় গোপন সহযোগীতা প্রদানের কৌশল ছিলো তাদের। যুদ্ধোত্তর দেশের এলোমেলো সামাজিক পরিবেশ, বিপর্যস্ত আইন শৃংখলা পরিস্থিতির সুযোগে অনেক মুক্তিযোদ্ধাই চুরি, ডাকাতি, লনটন ও নির্যাতনের মতো নানা অপর্কমে জড়িয়ে গেলো প্রতিক্রিয়াশীলতার ছত্র ছায়ায়। কেবল ক্ষমতাসীনদেরকে ক্ষমতা থেকে হঠনোর লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের যৌথ আয়েজান যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীলতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো, এর সব গুলো স্বাভাবিক ও বোধগম্য কারনেই আমাদের স্বাধীনতার চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মুল্য বোধকে ক্রমশঃ গলাটিপে ধরে। মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা বাঙালীর সকল মহৎ অর্জন একে একে ধ্বংশ হয়ে পড়ে। তথাকথিত বিপ্লবের নামে রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতি। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি, রণসংগীত, নেতৃত্ব, স্বাধীনতার ঘোষণা, জাতীয়তা ইত্যাদি মিমাংসিত বিষয় গুলো নিয়ে নানা কুচতর্কের সৃষ্টি এবং যুদ্ধকালনি সরকারের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উথাপিত হলো। যখন এভাবে খোদ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই দ্বিধা বিভক্ত এলো। মহল বিশেষের হঠকারী তত্ত্বে ও বক্তব্যে যখন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সার্বজনীন বিষয় গুলোকে একটা দলের দলীয় ব্যাপারাদি বলে চিহ্নিত করা হলো। স্পষ্টতঃ তা জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট হলো।

স্পষ্ট করেই বলি। একাত্তরে আমার বয়স যখন বারো। গন মিছিলে আর মুক্তি যোদ্ধাদের কণ্ঠে জয় বাংলা শ্লোগান, ঢাকা রেডিওতে এবং পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দেশাত্ববোধক গানগুলো বার বার করে শোনার এক প্রবল বোধ ও মানসিকতা আমার তৈরী হয়েছিলো। আমি তখন কোন দলের রাজনৈতিক কর্মী বা সমর্থক ছিলাম না। ছিলাম এক সাধারণ বাঙালী কিশোর। সেই 'জয়বাংলা' শ্লোগান আর স্বাধীন বাংলা বেতারের গান ও অন্যান্ন অনুষ্টান গুলো যেভাবে আমাকে নাড়া দিতো। পৃথিবীতে ক'টা জাতির ক'টা কিশোরের এমন অভিজ্ঞতা আছে আমি জানি না। আজো যখনই একাত্তরের স্মৃতি গুলো উকি মারে। আমি নির্দ্বিধায় আর নিঃসংকোচে তখন সেই পচিঁশ বছরের পুরানো অতীত প্রবেশ

করতে পারি। একাত্তরকে তখন আমার কাছে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং স্বতঃস্ফুর্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে আমাদের রাজনৈতিক হীনমন্যতা আজ এমন এক পর্যায়ে এসেছে,যে ক্ষেত্রে আমার সেই প্রিয় গান এবং শ্লোগান গুলোকে পর্যন্ত একটা দলের দিকে ঠেলে দিয়ে আমার হৃদয় মনকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে।

জানি, এমন অভিজ্ঞতা এবং উপলদ্ধি এখন প্রতিটি বাঙালীর। একাত্তরের বাংলাদেশের যারা বেঁচে থাকা মানুষ দীর্ঘদিনের প্রবল বৈরী সময়ের ভেতর দিয়েই তাদের দিনাতিপাত। একাত্তর যেনো মাতৃঅতীত। এতোকাল ধরে চারদিকে বিভ্রান্তির কি ব্যাপক প্রচারণা। যেখানেই প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ, সেস্পরশীপের যথেচ্ছা ব্যবহার।

কিন্তু, এমনতো কথা ছিলোনা। যদি নিরেপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা পূর্ণ বিশ্লেষণ খুঁজি তবে সংক্ষিপ্ত পটে দেখবো, একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যা স্পষ্টতঃ দৃশ-ৎমান, তা হচ্ছে দেশপ্রেম বিবর্জিত স্রেফ ক্ষমতা দখলের লড়াই। সে দিনের তাত্বিক আর বিপ্লবীর তাদের সকল মেধা, শ্রম দিয়ে কেবল রাষ্ট্র ক্ষমতারই পরিবর্তন চেয়েছিলেন। পচাঁত্তরের পট পরিবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ এবং এর পূর্ণ সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টির মুলে এরাই। পচাঁত্তর বিপ্লবের মূল কৃতিত্ব এদের। পরাজিত চক্রের ভূমিকা এতে মূখ্য ছিলোনা।

পচাঁত্তরে যা ঘঠেছে, তাতে আমাদের ঐ বিপ্লবীদের আম ও ছালা দু'ই-ই গেছে। এদের বর্তমান আকার আয়তন বিশ্লেষন করলেই তা ধরা পড়ে। হঠকারিতা, আত্মঘাতী প্রত্যয়, দেশ প্রেম বিবর্জিত অসাধুতার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ আর জীবনের বিপুল সম্ভাবনার প্রলোভন মন্ত্র নিয়ে যে মহা দৈত্যরা এক সময়ে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিড়েঁ খাবার হুমকি দিতো, আজ তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থানকে মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমই খুজে পেতে কষ্ঠ হয়।যদি ও এখন বিভিন্ন যুক্ততে পচাঁত্তর পরবর্তী সামরিক শাসক চক্র এবং এর উত্তরাধিকারীদের স্বাধীনতা বিরোধী ধারার একক দোসর হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, এতে করে এ ঘটনার আসল কারকেরা কিন্তু আড়াল থেকে যায়। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পুনরুত্থানে মুখ্য সহায়তাকারীর ভুমিকায় একাত্তর পরবর্তী সময়ে মুক্তি যোদ্ধার মুখোশধারী কিছু সংখ্যক সম্পদ ও ক্ষমতা লোভী এবং অতি বিপ্লবীরাই ছিলো। ক্ষমতার ভেতরে ও বাইরে সবর্ত্রই ছিলো এদের অবাধ বিচরণ।

চলমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় বাহ্যত সামরিক স্বৈরচার এবং স্বাধীনতা বিরোধী ফ্যাসিষ্ট চক্রকে দায়ী করা হলে ও সমস্যা সৃষ্টির মুল হোতা এরা নয়। এদের এক পক্ষ ক্ষমতা আঁকাড়ে ধরার মোছে এবং অপর পক্ষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যা যা করেছে তা ও অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাঙালী জাতী যখন একাত্ম হয়ে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তখন সকল শক্তি প্রয়োগ করেও দেশী বিদেশী শত্রুরা সফল হতে পারেনি। একই ভাবে জাতি যদি পরবর্তীতে পূণগঠন প্রক্রিয়ায় ও মনোযোগী থাকতে পারতো। তবে কার সাধ্য ছিলো বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ঠেকায়ে রাখে? এতে করে স্বাধীনতার শত্রু পরাজিত বৈরী শক্তি যে গর্তে ঢুকে আত্মগোপন করেছিলো, কার্যতঃ সে গর্ত থেকেই এক সময়ে এরা মরে পঁচে নিঃশেষ হয়ে যেতো।

অথচ ফল হলো উল্টো। দেশবাসীর জানামতে একমাত্র চিকন আলী রাজাকারের ফাঁসির আদেশ (কার্যকর হয়নি) ছাড়া আর কারো তেমন কোন শাস্তি হয়নি। স্বাধীনতার এই আড়াই দশকের মতো বয়সে একটা রাজাকারের ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা আমার জানা নেই।

CamScanner

তবে এ সময়ে কারণে অকারণে শত শত মুক্ত যোদ্ধার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে। সৌভাগ্যবান রাজাকারদের চোখের সামনেই ক্রমাগতভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মুক্তিকামী জনতা।

আক্ষেপ করেই বলি। একাত্তরের আমাদেরই অনেক স্বজনের চেতনা বিকৃতি। নৈতিক স্খলন এবং আপন স্বত্বাবিরোধী সমুহ অনাচারের ফলে বাঙালী জাতির যে ক্ষতি হয়েছে। তা কোনদিনই পুরণ হবার নয়। ভ্রান্তি বিপ্লবের ন্যায় ক্ষমতা দখলের অপরিকল্পিত ও অপরিশী-লিত লড়াইয়ে এরা নিজেরাতো ধ্বংস হলোই, একই সাথে সর্বনাশ হলো সারা জাতির। এরা সুযোগ করে দেয় মার্শাল ডেমোক্র্যাটদের। সামরিক দৈত্যেরা ক্ষমতায় থাকার জন্যে কি না করেছে। একদিকে মুক্তি সংগ্রামের সুসংগঠিত গণসচেতনতাকে গলাটিপে ধরেছে। অন্যদিকে তারা স্বাধীনতার মুল্যবোধ ও মুলনীতিগুলোকে বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী, সমাজ ও অগ্রগতির চিরশত্রুদের বুকে টেনে নিয়েছে। তাদের বেড়ে উঠার পথকে করে দিয়েছে নিবিঘ্ন। ক্ষমতায় দিয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশিদারিত্ব। সামরিক স্বৈরাচারের দেশে পচাঁত্তর পরবর্তী ষোলো বছরের অন্যান্য সাহায্য বাদে কেবল ঋণ হিসেবেই আশি হাজার কোটি টাকা গ্রহণ করে দেশটাকে চিরদিনের মতো বন্ধক রাখা হয়েছে। আজ এদেশে যে শিশু জন্ম নেবে, তাকে প্রায় ছয় হাজার টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই পৃথিবীর আলো দেখতে হবে। তাও দশ বিশ গুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার বিদ্যমান না থাকলে এ পরিমান আরো ভয়াবহ হতো এ পর্যন্ত সকল প্রাপ্ত সাহায্য ও সম্পদের হিসেবে নিলে দেখা যাবে, এর শতকরা পচাঁত্তর ভাগই লুটপাট হয়ে গেছে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা সামনে চলার বদলে ঘুরছে পেছন দিকে।

মোটকথা, স্বাধীনতা উত্তর কালে সৃষ্ট বেপরোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ব্যাপক বিভ্রান্তির সুযোগেই সামরিক স্বৈরাচারের সফল উত্থান। আর এ অপশক্তির পরম আতিথেয়তায় জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তি ও মৌলবাদের পুনরুত্থান এবং অপ্রত্যাশিতহারে তাদের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। শাসক চক্র তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোষা কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে ফ্যাসিজমকে, গৃহ ভৃত্যের মতো আশ্রয় দিয়ে লালন করেছে সন্ত্রাস। মার্শাল ডেমোক্রেসীর নখের আঁচড়ে রাজনীতি হয়েছে ছিন্নভিন্ন। রাজনীতিবিদরা হয়েছেন পণ্য। 'টু-মেক পলিটিকস ডিফিকাল্ট' এর ফর্মুলায় রাষ্ট্র যন্ত্রের গুরুত্বপুর্ণ পদগুলোতে আসীন হয়েছে সরাসরি স্বাধীনতার বিরোধীরা। অন্যদিকে এমনও হয়েছে যে জ্যান্ত দেহ কোনদিন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর উপরে পা রাখেনি তা আত্মাহীন হওয়ার পর হেলিকপ্টারে চড়ে কবরের আশ্রয়ে ছুটেছে। সারা জীবনের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে খুব সহজেই খোলস পরিবর্তন করেছেন অনেকে। আর এ সংখ্যা ভয়াবহ। কলম খাতার বদলে কোমলমতি ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে অস্ত্র। দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নামকরা ডাকাত, চাঁদাবাজ ও হাইজ্যাকারদের অন্ধকার আখঁড়ায় পরিণত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আজ সর্বত্র মেধার চরম ঘাটতি। সর্বস্তরে ঘুষ, দুর্নীতির অবাধ বিচরণে এক ভীতিকর অবস্থা। আর এ সব ক্রিয়াকর্মের যুগ্ম ফলাফলে আমাদের এগিয়ে যাবার পথ হয়েছে রুদ্ধ। এদেশের অদুর ভবিষ্যতে সিভিল ও সেক্যুলার সমাজ গড়ে উঠার সম্ভাবনা হয়েছে তিরোহিত। আইন ও সামাজিক ন্যায় বিচারকে হঠিয়ে নানা অপকর্ম ও অপরাধবোধের ব্যাপক উপস্থিতি আর এগুলোর লাগামহীন দাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্র সমাজ জীবন আজ আশংকাজক ভাবে বিপন্ন।

CamScanner

এ সব কিছুই আমাদের হাতে গড়া নিয়তি, নিজেদের বোনা ফসল। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিলো বিভেদ সৃষ্টি। তারা পুরোমাত্রায় সফল হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আজ আত্ম পরিচয়েরই দ্বিধাবিভক্ত। আমরা আজ কেউ বাঙালী, কেউ বাংলাদেশী। জাতীয় ঐক্যমত সে আজ এক সোনার হরিণ। আজ এদেশের মুক্তি সংগ্রামীরা নানা ফাঁদে আটকা পড়ে আছেন। বাহ্যিকভাবে এ ব্যাপারগুলোকে রাজনীতির আর্দশগত বিভেদ মনে হলেও কার্যতঃ তা নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুবাদে আজ অনেকে অতিমাত্রায় চিৎকার করলেও তাদের ভমিকা কিন্তু এ পর্যন্ত স্বরিবোধী। এরা যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধারের কথা বলেন তখনই তাদের অসংলগ্ন আচরণ ও স্ববিরোধিতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে তাদের বর্তমান অতীত ক্রিয়াকর্মের ধারাবাহিকতায়। আসলে এদের মন মানসিকতা, চরিত্র, সাহস, শক্তি সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এরা এখনো তাই ধারাবাহিকভাবে এবং দিক থেকে গ্রহনযোগ্য ভিত্তির উপর সংগঠিত হতে পারছেন না। যে কারণে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং এর মাধ্যমে অর্জিত সকল মিমাংসিত বিষয়ে আমতা আমতা করে কথা বলেন। নিতান্তই পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। ফলে এদেশে চলমান পিতৃত্বের অনেকাংশের উপরই মুক্তিকামী মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার মতো কোন সংগত ভিত্তি তৈরী হচ্ছে না। রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা অন্যকথা। এটা থকাবেই। তাই বলে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসীরা কেউ কেউ আবারো 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেবে? বাংলাদেশের অভ্যুদয় কে দুই রাষ্ট্রের 'চির শত্রুতার ফসল' বলে গোটা ব্যাপারটিকে অবমুল্যায়ন করবে? জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ ভিত্তিক কতকগুলো মৌলিক সত্যের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তুলতে না পারলে ব্যাপারটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

পুনরুক্তি করে বলি পচাঁত্তর পরবর্তী ইতিহাস, আমাদের জাতির জীবনে কেবলই আত্মহননের উৎস ও আত্মপরিচয়ের বিপরীতে যাত্রার ইতিহাস। পচাঁত্তরে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে শুরু হয় সেই পুরানো ভিটেয় পুরানো ঢংয়ে নতুন করে বাংলো বানানোর বিকৃত আয়োজন। এ আয়োজন দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ পৃথিবীতে মাত্র দুটো দেশের স্বাধীনতার যথাযথ ঘোষণাপত্র আছে। এমন বিরল সম্মানের অধিকার একটা জাতির স্বাধীনতার প্রায় উষালগ্ন থেকেই তার বীরত্বগাঁথা, নজিরবিহীন আত্মদান ও মুক্তির সংগ্রামকে এতদিন ধরে যথাসম্ভব হালকা করে দেখার বিরামহীন প্রয়াস চলেছে খুবই সূক্ষ্মভাবে।

একটা ইতিহাসতো একদিনেই গড়ে উঠেনা। বলা যেতে পারে, সূচনা পর্বেই ইতিহাসের সবগুলো উপাদান অর্জিত হয় না। গতিশীল ধারায় এগিয়ে চলে ইতিহাসের প্রবাহ নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তা এক সময়ে একটি অর্থবহ পরিণতি লাভে সক্ষম হয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এমনি এক অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা। হঠাৎ একদিন, একাত্তরের ২৬কি ২৭মার্চ। কেউ একজন গর্জন করে বাঙালীদের বললেন, যুদ্ধ করো। ছিনিয়ে আনো স্বাধীনতা। আর অমনি বাঙালীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাঙালী তো এমন অবোধ কিছু নয়। এ রকম একটা কথা জানাতে বাঙালীকে সময় লেগেছে বহুদিন। বাঙালী জানে যদি না একাত্তরের ৭ মার্চ, তবে কি করে মুক্তিযুদ্ধ। যদি না মুক্তিযুদ্ধ তবে কি করে আমাদের বর্তমান, এ সত্ত্বা, এ অবস্থান।

যদি না '৪৮ সালে মাতৃভাষা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র, তবে কি ৫২ এর ভাষা আন্দোলন। যদি

না ভাষা আন্দোলন, তবে কি করে যুক্তফ্রন্ট-৫৪ এর নির্বাচন। যদি না যুক্তফ্রন্টে সাহসী ঐক্য নিরঙ্কুশ বিজয়, তবে কেনো '৫৮ সালে সামরিক শাসন। আর যদি না এ সামরিক শাসন, তবে কেনো বাঙলীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের প্রশ্ন, গণতন্ত্রের শপথ। কি করে ইতিহাসের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা। ৬ দফা না হলে, কেনো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। আর যদি এ মামলাই না হতো, তাহলে কি করে '৬৯এর গণঅভ্যুত্থান। কি করে সিংহের মতো গর্জে উঠে ঘুমন্ত বাঙালী। কি করে তারা ফাঁসির রজ্জু থেকে ছিনিয়ে আনে তাদের আরাধ্য পুরুষ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। কেনো বরমাল্য গলে পরিয়ে তাকে বানায় 'বঙ্গবন্ধু'।

বঙ্গবন্ধু না হলে কি করে '৭০ নির্বাচন, স্বাধিকার অর্জনে বাঙালীর নিশ্চিদ্র ঐক্য, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনতার চূড়ান্ত রায়।

এরপরেইতো একাত্তর। যেখানেই বাঁধা, সেখানেই আঘাত। সশস্ত্র প্রতিরোধ-মহৎ অর্জনের লক্ষ্যে কি অপ্রতিরোধ্য ও অভূতপূর্ব অভিযাত্রা। এর বাইরে কি ইতিহাস আছে আমাদের?

কি কপটতা, কি চাতুর্য। একাত্তরের ৭ মার্চ কিছুই শোনেনি-যেনো একেবারেই নাবালক। ২৭ মার্চে শুনলো মাত্রাতিরিক্ত তখন পুরোপুরি সাবালক। প্রতিরোধ দেখেনি, অথচ পালিয়ে যেতে দেখেছে। দেখেছে আত্মসমর্পনও। রণক্ষেত্রে কেবল 'বাংলা' বলেছে-'জয় বাংলা' নাকি বলেনি। বৈদ্যনাথ তলার ঘটনাবলি হিসেবেই নেই। স্বাধীনতা ঘোষণার ড্রামতত্ত্ব আর ত্রিশের শুন্য ছেঁটে তিন লক্ষ মৃত্যুর হিসেব দিয়ে পরাজিত বৈরীশক্তির পক্ষে কি ওকালতি। আস্থা ও আনুকূল্য লাভের আশায় কি ব্যাপক তৎপরতা। জাত গেলো, দেশ গেলো, ধর্ম গেলো। গেলো গেলো বলে চিৎকার। জঘন্য কি সব অপপ্রচার। কেবল জনমনে পুরোনো কায়দায় ভয়-ভীতি-ত্রাসের সঞ্চালণ। লক্ষ্য ক্ষমতা, ক্ষমতা চাই। যা কিছুর বিনিময়ে হোক আপত্তি নেই। এ জন্যেইতো পঁচাত্তর। ফেলে আসা অতীতের শিক্ষাই হলো মূলমন্ত্র। তাই সকল অর্জনকে পদদলিত করে কেবলই পেছনে ফেরা।

ইতিহাস কালজয়ী। কালের সংকীর্ণতা পেরিয়ে কালান্তরে এর সদর্প পদচারণা। লুটেরা সংস্কৃতির দূর্ভেদী রাহুগ্রাস এ সময়ে বিপর্যস্ত করেছে, প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় যে মানুষটিকে। তাকে দূরে কোথাও পুঁতে রেখে যারা পেয়েছে ক্ষণিকের আত্মতৃপ্তি। তারাই ভুল করেছে। টুঙ্গিপাড়ার কবর থেকে খুব সহজেই এ মানুষটি উঠে এসেছেন বাঙালীর হৃদয়ে। বরং স্বঘোষিত 'সূর্যসন্তানরা'ই আজ নিগৃহীত। সকল তন্ত্রমন্ত্র এখন অকেজো। ইতিহাসের কালো অক্ষরের ফ্রেমে তাদের অভিধা 'কুলাঙার', অভিশপ্ত, আরো অনেক কিছু।

যারা ভেবেছিলেন, নব্বুই এর গণঅভুত্থানের পর সব ভেসে যাবে। তাদের ধারণা মোটেই যৌক্তিক ছিলো না। আজো যারা আপোষ রফার বিভিন্ন ফর্মুলা, অজানা আংশকার আভাস এবং নানা কথার ফুলঝুরি দিয়ে সংকট ও সমস্যা উত্তরণের আবেদন নিবেদন করেন, তাদেরকেও বলি এমন আশাবাদ ও যুক্তিযুক্ত নয়। নব্বুই এ যে যৌথ ঘোষণা এসেছিলো, তা ছিলো একটা দ্বিজাতীয় আপাতঃ সন্ধি-চুক্তি। বিস্ময়কর বিজয়ের তোড়ে এর বেশিরভাগ ধারাই পরে ভেসে গেছে। তৃতীয় শক্তির মোকাবেলায় বাঙালী এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সমর্থকদের মধ্যে এ চুক্তিটি সাময়িক সমঝোতার জন্যে যথেষ্ট মনে হলেও পেছনে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী কিন্তু অভিন্ন ছিলোনা। সুতরাং এ রকম ঐক্যের দীর্ঘসুত্রিতা ও কার্যকরণ যে কতটুকু তা খুব সহজেই প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য জনগণের

সক্রিয়তা ছিলো বলেই নব্বই এর আন্দোলনে ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ছিয়ানব্বই তে তা পর্যায়ক্রমিক স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে আমরা যে অবস্থানে আছি, এর থেকে কয়েকগুণ পেছনে গেলেও কার্যকর সমঝোতা সৃষ্টির সুযোগ এখনো খুবই কম। আমাদের পিঠ সহজে দেয়ালে ঠেকে না। আমরা এ সবরে তুয়াক্কা করিনা। অথচ আমাদের চেয়ে আরো বেশী খারাপ আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে পৃথিবীর বহু জাতি কত দ্রুত উন্নতি হয়েছে। কারণ তাদের বেড়ে উঠার প্রথম ও প্রধান উপাদান কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত আছে। ক্ষমতার বদল হবে। রাজনীতিতে নানামুখী পরিবর্তন, মেরুকরণ ইত্যাদি ঘটবে। কিন্তু আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জাতির পরিচয় ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় না এটাই নিয়ম। আমাদের সব বদলে যায়। আমরা বেয়াকুবের মতো আপাতঃ সমস্যা নিয়ে অনেক কিছুই বলি, অথচ আসলে সমস্যা নিয়ে কিছুই বলিনা-গভীরে যেতে চাইনা। অনেক কিছু যেনো জেনে ও জানিনা। সব কিছু যেনো বুঝে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা।

এই পাপই আমাদের গ্রাস করেছে। আমরা যারা একাত্তরের বাংলাদেশের মানুষ, যারা এখনো বেঁচে আছি, আমাদের চোখ কানতো বন্ধ হয়ে যায়নি। স্মৃতি ও জরাগ্রস্ত হয়নি। অথচ প্রতারণা ও বিভ্রান্তির কূটকালে আমরা সবাই আজ আদর্শ ও লক্ষ্যচ্যুত। সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে বয়সে আবার তরুণ। আমাদের সন্তান, নতুন প্রজন্মের বেলায়। বড় হতভাগ্য তারা, তাদের জীবন অভিশপ্ত যেনো যাযাবর তুল্য। তারা ছিন্নমূল উদাস্তুর মতো পায়না উৎসের প্রকৃত সন্ধান। তারা জানেনা তাদের সঠিক ইতিহাস। যা জানে সবই কেবল শোনা কাহিনী। তারা জানেনা তাদের পিতৃ পুরুষের প্রকৃত গৌরব গাঁথা, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব, গুরুত্ব ও আসল ধারাবাহিকতা। অথচ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে একটা মানব গোষ্টিকে বার বার করে তার উৎস, আত্ম পরিচয় ও মহৎ অর্জনের ইতিহাস জেনে নিতে হয়।

এ কারণেই বারবার প্রয়োজন একাত্তরে প্রত্যাবর্তনের। একাত্তরের বাংলাদেশ থেকে সাহস ও শক্তি আহরণের।

সময় এসেছে আমাদেঁর সকলকে অনুতপ্ত হয়ে আবারো হৃদয়ে সাহস নিয়ে সৎ ও নিশ্চিদ্র ঐক্য গড়ে তোলার। একাত্তরের মতো আবার মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনা ও ভিত্তির উপর শক্তভাবে দাঁড়ানোর। এর কোন বিকল্প নেই।

একাত্তরের বাংলাদেশের মানুষেরা, তাই আপনাদের বার বার উনিশ'শ একাত্তরের বাংলাদেশে স্বাগত জানাই।

কবিতায় জার্নালিজম ঃ প্রেক্ষিত শামসুর রাহমান

হেলাল আহমদ চৌধুরী

প্রভাষক বাংলা

কবি শামসুর রাহমানকে আমরা সবাই চিনি। এমনকি তাঁর গদ্য, আত্মজৈবনিক ও স্মৃতিচারণমূলক রচনা, যাতে তাঁর কবি সত্ত্বার সম্প্রসারণ প্রমূর্ত, তার সঙ্গেও আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। স্বদেশ, স্বসমাজ ও সমকালের নানা প্রতীতি ও অপ্রতীতি নিয়ে লেখা তাঁর সাম্প্রতিক কলামগুলিও বহু পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শান্তির জন্য অভূতপূর্ব অভ্যুদয়ে ও সংগ্রামে সারা পৃথিবী যখন টালমাটাল, তখন বায়ান্নতে একটা অনাহুত জোয়ারের গণঅভ্যত্থানের টর্নেডো উঠেছিলো বাংলাদেশে তথা পূর্ববাংলায়। সেই সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পোড়ো প্রাসাদে প্রয়োজন দেখা দিলো পূনঃসংস্কারের কাজ। এই কাজের ধারক ও বাহক হয়েছিলেন এক তরুণবয়সী বিদ্রোহী কবিগোষ্ঠি। বের হলো ৫৩'র মার্চে অগ্নিস্তাবক কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন গ্রন্থ। এই গোষ্ঠির বিপ্লব ও স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিদ্রোহী প্রবক্তা কবি শামসুর রাহমান। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর কবিতায় জার্নাল কিভাবে প্রকাশ লাভ করেছে তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হলো। ব্যক্তিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন তুখোড় সাংবাদিক বিধায় তাঁর কলাম থেকে সঙ্গত: কারণেই বেরিয়ে আসে প্রতিবাদ মুখর জ্বালাময়ীশব্দ, বর্ণ যা থেকে জন্ম নেয় এক একটি সংবাদপৃষ্ঠ কবিতার অবয়বে। 'শূন্যতায় তুমি শোক সভা' গ্রন্থে তিনি নিজেকে নিয়ে 'পারিপার্শ্বিকের আড়ালে' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন এভাবে–

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, নিজের কাছেই
বন্দী সর্বক্ষণ।
প্রতিদিন শহরের সবচেয়ে করুণ গলির মুখোচ্ছবি
মুখের রেখায় নিয়ে হাঁটে ফুটপাতে।

আধুনিক উত্তর বাংলা কবিতার এক প্রধান পুরুষ কবি শামসুর রাহমান। তিরিশ শতকের বাংলা কবিতায় পাঁচজন মহৎ কবি ছিলেন; যাঁদেরকে বাংলা আধুনিক কবিতার 'পঞ্চপাণ্ডব' বলা হয়ে থাকে। তাঁরা হলেন : সুধীনদ্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী। এই পঞ্চপাণ্ডবের মতো তিরিশের সব ডাকসাইটের কবিদের পথ ধরেই বাংলা কবিতায় শামসুর রাহমানের আগমন। তাঁর কাব্যেই জাতির আশা–আকাঙ্ক্ষার শিল্পসম্মত প্রতিফলন ঘটেছে। কবিতায় তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন সমকালের বিস্রস্ত সংবাদরাজি। সাজিয়ে দিয়েছেন তা কবিতার স্তবকে স্তবকে। তাঁর কাব্যে সমকাল প্রকাশ পেয়েছে বিবরণে ও বর্ণনায়; সেই সাথে তিনি সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর অপর্যাপ্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ক্ষোভ ও বেদনা।

শামসুর রাহমান একজন অলৌকিক সাংবাদিক। তাঁর এ সাংবাদিকতা স্পষ্টভাবে ভাষা পেয়েছে তাঁর 'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্যের 'নিজস্ব সংবাদদাতা' কবিতায়। 'এখানে যা উল্লেখ্য, তা হচ্ছে এ–কবিতার দেবদূতগণ যে–অগ্নিকান্ত সাংবাদিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ,

তাঁর নাম শামসুর রাহমান। তিনি তথ্যের সাথে ব্যক্তির, মানুষের, সময়ের বেদনাকে পরিবেশন করেন।' সমকালের প্রতিবেশ পৃথিবীর এবং উপদ্রুত জীবনের সংবাদরাজিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি কবিতার মুখোশ পরাতে পারদর্শিতার ভূমিকা রেখেছেন। কবি মাত্রেই অন্তর্লীন সাংবাদিক, কেউ স্বপ্নের, কেউ সৌন্দর্যের, কেউবা বস্তুবাস্তবের। শামসুর রাহমান সমকালীন সমাজের ব্যর্থতা, ক্লান্তি, দুঃখ, সৌন্দর্য, শূন্যতা, যন্ত্রণা এবং হাহাকার প্রভৃতি মানবিক সংবাদ আগামী দিনের জন্য কবিতায় প্রকাশ করে নতুন যুগ প্রতীতির জন্ম দিয়েছেন। দুঃখ সম্পর্কে তার ধারণাঃ

আমাদের বারন্দায় ঘরে চৌকাঠে
কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম।

প্রথম মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, মর্মান্তিক স্বাধীনতা, নেতাদের চরিত্রহীনতা, জীবনের সীমাশূন্য অপচয় সবকিছু তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করেছেন একজন দক্ষ সাংবাদিকের ভূমিকা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নিজ বাসভূমে' কাব্যের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। কাব্যের 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯', 'হরতাল', 'আসাদের সার্ট', 'এ শহর' এবং 'দুঃস্বপ্নের একজন' প্রভৃতি কবিতায় উনসত্তরের গণআন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং সমসাময়িক নোংরা রাজনৈতিক অপ্রতীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'আসাদের শার্ট' কবিতায় কবির দৃপ্ত কণ্ঠের প্রত্যয়জাত শ্লোগান লক্ষ্যণীয়–

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের সার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

কোনো কবি সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁর সমকালের প্রতীতিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব; বরং তাঁর রচনার বাঙময়তায় স্বদেশ, স্বকাল, স্বসমাজের ছায়াপাত ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে শামসুর রাহমানও ব্যতিক্রম নন। তাঁর কাব্যে সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক সমস্যা, আবেগ অনুভূতি, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সার্থকরূপে সম্পৃক্ত। তিনি সমকালকে উপস্থাপন করেছেন এ্যালিগরি এবং সিম্বলের মাধ্যমে। তাঁর সমকাল ছিলো একনায়ক হননপ্রিয়। তাঁর রাষ্ট্রের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে হিংস্র পশুরা। সঙ্গত: কারণেই তাঁর কাব্যের নামকরণ হয় 'ফিরিয়ে দাও ঘাতক কাঁটা'। দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য তবুও তিনি উপলব্ধি করেন পরাধীনতার শৃঙ্খলকে। তাঁর চেতনাবোধে ঘা দিয়ে উঠে বিগত মুক্তি যুদ্ধ আজ সম্পূর্ণ বৃথা বলে। সুতরাং সৃষ্টি হয় 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানায়;
মুক্তিযুদ্ধ হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়।

শামসুর রাহমানের অনেক কবিতায় স্বদেশ চেতনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রোজ্জ্বল ভাষা পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর 'বন্দী শিবির থেকে' কবিতা গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে এর মৌল বিষয় হচ্ছে 'এ দেশ আজ 'বন্দী শিবিরে' পরিণত। এদেশের চারিদিকে হানাদার বাহিনীর নৃশংস আক্রমণ, বিষাক্ত ছোবল। একজন সাংবাদিকের রিপোর্টের ন্যায়, 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি বলেছিলেন' কিংবা 'সান্ধ্য আইন' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর সংবাদপৃষ্ঠ দুঃসাহসী কবি

মানসের পরিচয় পরিস্ফুট। এখানে কবি যেনো ঘুরে ঘুরে এক সংকটময় বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করছেন। কবি দেখতে পেয়েছেন চারিদিকে লক্ষ লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। মা-বোনের ইজ্জত বর্বর হানাদাররা লুটে নিচ্ছে। অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিচ্ছে পিতা-মাতার লাশের উপর। ছাত্রাবাস-বস্তি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। আর এসবই যেনো একজন ফটোজার্নালিস্টের ফটোগ্রাফি; যা সিনেমাটোগ্রাফিক টেকনিকের পর্যায়ে ফেলে সর্টফিল্ম নিম-ার্ণ-শৈলীর পরিকল্পনাযোগ্য। মূলতঃ লাঞ্ছিত বাংলার এ করুণ অবস্থা দেখে কবির সংবেদনশীল আত্মা গুমরে উঠে একজন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকের দৃষ্টি নিয়ে। ফলত: জন্ম নিলো 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি। বলাবাহুল্য কবিতাটি শিল্পাচার্য জয়নুলের দুর্ভিক্ষকেও যে স্মরণ করিয়ে দেয় তা অনস্বীকার্য-

স্বাধীনতা, তোমার জন্য
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।

তাঁর সমকালে চারিদিকে 'গুলির ইস্পাতি শিলাবৃষ্টি।' এ সোনার দেশ 'দাউদাউ পুড়ে যাচ্ছে', এখানকার সবাই 'পালাচ্ছে শহর ছেড়ে বন পোড়া হরিণীর মতো' দিকবিদিক। হানাদার বাহিনীর এহেন বর্বরচিত্র যে বাংলা কবিতায় এক সাহসী সংযোজন তা অনস্বীকার্য। 'তুমি বলেছিলে' কবিতার যে মৌল বিষয় তা হচ্ছে বাংলা মা তথা এক অসহায় নারীর আকুল আর্তনাদ ইকোয় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে পৃথিবীময়, যে তার একান্ত আপন পুরুষটিকে এই বলে আহ্বান করছে 'আমাকে বাঁচাও এই বর্বর আগুন থেকে'। অথচ সে জানেনা তাঁর কাঙ্ক্ষিত পুরুষটিও হিংস্র বর্বরতার নৃশংস শিকার। কবি সেই অসহায় পুরুষটির আর্তচিৎকার তাৎক্ষণিকভাবে কবিতার শাব্দিকজার্নালে রিপোর্ট করেন এভাবে-

তুমি বলেছিলে, 'আমাকে বাঁচাও'
অসহায় আমি তাও বলতে পারিনি।

এভাবে সমসাময়িককালের বীভৎসতা, হানাদার বাহিনীর বর্বরতা তুলে ধরেছেন তাঁর 'সান্ধ্য আইন' কবিতাটিতেও। কবিতাটি ঐতিহাসিক গণহত্যার কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। পাকহানাদার বাহিনীর বীভৎসতা, বর্বরতা কবির সাংবাদিক দৃষ্টিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে পারেনি; বরং বীভৎস চিত্রের ভাষা ছবি এঁকে কবি উল্লেখ করেন-

আশে পাশে আছে গাছ-গাছালির শোড়া।
পাতার আড়ালে জ্বলছে সে কার চোখ?

দুঃসহ সময় ও জীবন এবং প্রতিবেশ পৃথিবী শামসুর রাহমানের কবিতায় বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় প্রোজ্জ্বল ভাষা পেয়েছে। সমকালের হীনতা সম্পর্কে যুগপৎ চিন্তাচেতনা ও ধীমান প্রত্যয় এবং তাঁর কবিতায় অন্ধশাসিত এক দুঃসময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা ক্ষুব্ধ বিক্ষোভের সাথে উচ্চারিত। তাঁর কবিতা কখনো কখনো উপস্থাপিত হয়েছে আবেগস্পন্দিত তথ্যপুঞ্জে, সমকালের বিশ্বস্ত ও প্রোজ্জ্বল দলিলে। গভীর সংকটের সময় তার কণ্ঠে আমরা অর্ফিয়ুসের দুর্বার সংগীত শুনেছি। তার বস্তুনিষ্ঠ জার্নালজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কারণেই সমকালের সবোদ তাঁর হাতে কবি ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং বাংলা আধুনিক কবিতাকে আরো এক ধাপ সমৃদ্ধির সোপানে এগিয়ে নিয়ে গেলো নিঃসন্দেহে।

CamScanner

অন্তর্লীন যন্ত্রণা

জহিরুল হক

প্রভাষক অর্থনীতি

দুপুর এখনও শেষ হয়নি। যাই যাই করছে। বিকাল আসি আসি। সোহান ঘুম থেকে উঠে সবেমাত্র চা নিয়ে বসেছে। এই সময় দেখতে পেল জিতু ঢুকছে ওদের বাসায়। ওরা দু'জনেই শাহজালাল ভার্সিটিতে পদার্থ বিজ্ঞানে পড়ে। একটু আশ্চর্য ধরণের ছেলে জিতু। ইয়ার ফাইনেল পরীক্ষার আর দু'মাস ও নেই, অথচ জিতুর পড়ালেখা এখনও শুরু হয়নি। এ ব্যাপরে ওর কোন মাথা ব্যাথাও নেই। ওর কাজ হলো সারা দিন আড্ডা মারা, সময়ে অসময়ে বন্ধুদের বাসায় এসে বিরক্ত করা, সত্য কথার চেয়ে মিথ্যা কথাই বেশী বলা, আর যখন কোথাও আড্ডা মারার জায়গা না থাকে তখন রুমে শুয়ে উপন্যাস পড়া। সোহান জানালা দিয়ে দেখলো জিতু গেট খুলে বাসার ভিতর ঢুকছে। এটকু পরে শুনা গেল তীব্র কণ্ঠে ডাকছে, 'সোহান, ও সোহান'।

সোহান জিতুর ডাক শুনে না হেঁসে পারলো না। জিতুর এই একটা গুণের জন্যে শুধু ওর সাথে সবাই মেশে। ও সবাইকেই বেশ হাসাতে পারে। সোহান ওকে ভিতরে নিয়ে গেল। রুমে ঢুকে সোহান বলল, 'কি ব্যাপার! এই দুপুর বেলা আবার কি মতলব নিয়ে এলি?'

'যা-বাবা! তোর কাছে এখনও দুপুর নাকি? আমিতো ভাবছি বিকাল হয়েছে সেই কখন!

'তা এতক্ষণ কোথায় কি করে বেড়ালে?

'হায় দোস্ত রুম থেকে কেবল বেরিয়েছি, দেখি এক ঝাক ডানা কাটা...'

'আস্তে ! ভাইয়া আছে পাশের রুমে।'

'ও-সরি, ইয়ে মানে দোস্ত হেভী সুন্দরী একটা ছিল। তুই দেখলে...'

'থাক হয়েছে। আমার এত দেখার দরকার নেই।'

'দোস্ত, নাসরিনকে দেখলাম বাসা থেকে বেরুল'। 'কোথায় গেলরে?'

নাসরিন সোহানদের পাশের বাড়ীর মেয়ে। এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছে। সোহানের নাসরিনের প্রতি দুর্বলতা অনেক দিনের। কোন ভাবেই এ কথা ওকে বলতে পারছেনা। জিতু সোহানকে অনেকবার বলেছে ওকে দেখে সরাসরি কথাটা বলতে। কিন্তু সোহান ওর সামনে গেলেই সব ভুলে যায়। অনেক দিন টেলিফোনে ওকে ডেকেও অন্য কথা বলেছে। নাসরিনের কথা শুনেও একটু উৎফুল্ল স্বরে বলল 'কার সাথে গেল রে?'

'সম্ভবত ওর ছোট বোন ও ভাইয়া সাথে ছিল।'

সোহান একটু বিষণ্ন গলায় বলল 'বোধ হয় মার্কেটিং-এ গেল।'

জিতু একটু চড়া গলায় বলল 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবেনা।' সোহান কোন কথা বলেনা। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ।

একটুক্ষণ পর জিতু আবার বলল 'সোহান, চলতো একটু ক্যাম্পাস থেকে ঘুরে আসি।'

CamScanner

'ক্যাম্পাসে কি?'

'চল, বিকালটা কাটিয়ে আসি।'

সোহান আর কথা বাড়ালো না। বাড়লেও লাভ হতো না, তা ও জানে, জিতু যখন একবার বলেছে তখন যাবেই। তাছাড়া সোহানেরও কোথাও একটু ঘুরতে ইচ্ছে করছে।

সোহান রেডি হয়ে জিতুর সাথে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর এগিয়েই দু'জনে রিক্সায় উঠল। ক্যাম্পাসে ওরা যখন পৌঁছালো তখন শেষ বিকেলের রোদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অদূরে টিলা গুলোয় মনে হচ্ছে কেউ বুধ হয় আগুন রঙের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ক্যান্টিনের কাছাকাছি আসতেই জিতু চলন্ত রিক্সা থেকে নেমে দৌড় দিল। এটা জিতুর আর এক ধরণের দুষ্টামি, ওর সাথে রিক্সায় কেউ উঠলেই তাকে ভাড়া দিতে হবে। আবার একটু পরেই দেখা যাবে ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশিই সে খরচ করেছে। সোহান মনে মনে হাসছে কিন্তু ওপরে বেশ গম্ভীর ভাবেই রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ক্যান্টিনের দিকে এগুলো। হঠাৎ জিতু যেন এক লাফে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করল। জিতুর কাণ্ড দেখে সোহানের গলা ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছা করল। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল 'পাগলামী করিসনাতো! কি হয়েছে বল আগে।'

জিতুর নাচ আরও বেড়ে গেল। ও নচাতে নাচতে গানের সুরে বলল 'হায় মেরি দোস্ত তুমকো নাসরিন কেন্টিনমে....'

সোহানের মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর ঠিক বিশ্বাস হল না। ভাবল জিতু বোধ হয় মিথ্যা বলছে। তবুও জিতুকে জোর করে থামালো। ভালভাবে জিজ্ঞাসা করল। জিতু বলল– 'কসম বলছি আমি নাসরিনকে কেন্টিনে বসা দেখেছি।'

সোহান জিজ্ঞাসা করল 'ওর ভাইকে দেখলি না?'

'না–তো! মনে হল ও একাই বসা।'

সোহান একটু অন্যমনস্ক হল। জিতু আবার বলল 'দোস্ত শোন, আজ যেভাবেই হোক কথাটা বলে ফেলবি। ওর আচরন দেখে তো আমার মনে হয় শুধু একবার বললেই ও রাজি হয়ে যাবে। তুই যা, ওখানে গিয়ে দেখ কি অবস্থা।'

'অবস্থা ভাল বুঝলে ওকে নিয়ে কোনদিকে হাঁটতে বেরুবি। আর হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলে ফেলবি।'

সোহান আস্তে আস্তে ক্যান্টিনের দিকে এগুলো। ক্যান্টিনে ঢুকতেই নাসরিনের সাথে চোখাচোখি। পাতলা ছিপছিপে গড়নের উজ্জ্বল শ্যামলা, চশমা চোখে নাসরিন একটা চেয়ারে বসা। ক্যান্টিনে বেয়ারাগুলো ছাড়া আর কেউ নেই। সোহান ওকে একা দেখে একটু অবাক হল। ওর দিকে এগুতে এগুতে সোহান হাসলো, নাসরিনও মৃদু হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাদের ভার্সিটি দেখতে এলাম।'

সোহান একটু কাঁপা কাঁপা গলায় কৌতুক মিশিয়ে বলল 'এখানে বসেই বুঝি পুরো ক্যাম্পাস দেখা হচ্ছে?'

নাসরিন আগের মতই হাসতে হাসতে বলল 'প্রশাসনিক ভবনের ওদিকটায় ঘুরেছি। হঠাৎ কেমন জানি খারাফ লাগছিল, তাই এখানে একটু বসলাম, ভাইয়া আর রুমি ওদিকে

CS CamScanner

গিয়েছে।

এখন যদি খারাপ না লাগে তাহলে চল আমি ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।'

'হ্যা। আসুন ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখে আসি।'

সোহান নাসরিন দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগুলো। একাডেমিক বিল্ডিংএর পাশ দিয়ে হেঁটে ওরা রেষ্ট-হাউজের দিকে লম্বা রাস্তা ধরে চললো দূরে ছোট্র দো'তলা রেষ্ট হাউজ দেখা যাচ্ছে। তার পেছনেরই ছোট্র টিলা। বিকেলের রোদ শেষ হয়ে এসেছে। টিলাগুলোর একেবারে চুড়ায় সোনালী রোদ দেখা যাচ্চে। লম্বা রাস্তা ধরে ওরা দু'জন পাশাপাশি হাটছে। সোহান হাত নেড়ে নেড়ে আশেপাশে দেখিয়ে কোনটা কি তা বুঝাচ্ছে। এরই মাঝে বেশ কয়েকবার সোহান নাছরিনকে কথাটা বলতে চেয়েছে, কিন্তু সে তা বলতে পারেনি। ওর কাছে তখন কথাটি বলা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। যখনই সে কথাটি বলতে গেছে, তখনই তার অতীত ইতিহাস তাকে দ্বিধাগ্রস্থ করেছে। সে ভাবছে, বাবা ছিলেন একজন তুখোড় মুক্তিযোদ্ধা। পাঁচ বছরের অবুঝ সোহানকে রেখে তিনি সেই যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন-আজও ফিরলেন না। শুনা যায় তার মাকেও নাকি পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্যাম্পে। অথচ তিনি ফিরলেন তবে কলংক নিয়ে। এখনও কিছু কিছু লোক সে সব ইতিহাস মাড়ায়। এখনও সোহানকে সে সব ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয়।

একসময় নাসরিন সোহানকে বলল 'কিছু বলছেন না যে? কি ভাবছেন?'

'ভাবছি! ভাবছি আমার অতীত। ভাবছি আমার এই মুহূর্ত। যে মুহূর্তটি আমাকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে যায় অতীতের সেই বীভৎস দিনগুলোতে। অথচ জান, আমি একটি কথা চি ৎকার করে বলতে চাই...।

নাসরিন শুধু বলল 'আমি জানি'

সোহান বিষন্নভাবে বলল, 'তবে যে আমার অতীত?"

নাসরিন চোখে চোখ রেখে বলল, "তাতে কি?"

ফেরারী অবগুণ্ঠন

আফলাতুজ্জামান বাবলু
প্রভাষক, সমাজ বিজ্ঞান

আমি কি কখনো ফিরে যাবো না?
সময়ের 'সাতপাকে বাঁধা যে জীবন,
সে কি শুধুই অস্থির ঘড়ির কাটায় টিক্ ঠিক?
সুস্বয়, সুসময় কেবলই ফেরারী
স্পর্শ করলেই যেন ঝরে পড়ে যায়।
দ্রুততম ট্রেনের মত ধাবমান
আমার প্রিয়তম শব্দগুলো
ক্রমেই দূরে–দিগন্তে মিশে যায়।
অনিয়মের এ প্রধান শতাব্দিতে
প্রেম এবং যুদ্ধে নাকি নিয়ম চলে না!
অথচ একজন প্রেমিককে হতে হয় আদর্শের পূজারী
এবং একজন যোদ্ধাকে হতে হয় সংশপ্তক;
তাহলে কি সবটাই ভুল।
মিথ্যা এবং অসত্যই জয়ী হয়ে যায়?
শিশুক মাছের মত প্রতিনিয়ত
অক্সিজেন খুঁজে নেবার নিরন্তর প্রত্যাশায়
আমি ক্রমাগতই হারিয়ে যাই
স্বপ্নিল অতীতের অনুপম জানালায়।
বস্তুতঃ আমার বর্তমান, অতীতের স্বর্ণআলোয়
প্রতিনিয়তই উদ্ভাসিত
এবং আবেগের টগ্‌বগে অশ্বটি
আজ কাঠের মূর্তি হয়ে ঠায় নিরব।
ভাবতে অবাক লাগে
একি অনিয়মের টিক ঠিক
নাকি মানুষের জীবন এবং
সে সবটাই অলীক।

অরক্ষিত ভালবাসা

তোফায়েল আহমেদ

প্রভাষক পদার্থবিদ্যা

তরুণী তোমাকে খুঁজে বেড়াই
উগ্র মেকআপ করা কোন নারীর লাল ঠোঁটে
তরুণী তোমাকে খুঁজে বেড়াই
কপোত কপোতীর কোন এক আবেগঘন রোমাঞ্চে
তরুনী তোমাকে খুঁজে বেড়াই
সুদর্শন কোন এক যুবকের লোমশ বুকের উপর
তরুণী তোমাকে খুজে বেড়াই
কোন এক নির্জনে বৃদ্ধ বৃদ্ধার পথ চলার আনন্দে
তরুনী তোমাকে খুঁজে বেড়াই
বিশ্বখ্যাত কোন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের নেপথ্যে
তরুনী, তোমার পরিচয়?
সাম্যবাদ? ভালোবাসা?? নাকি–
বিজয়? তাই হয়তোবা ....।
বিজয়, তোমাকে দেখলেই আমার যত কষ্ট
তোমাকে ভাবলেই আমার যত হাহাকার
তোমাকে কাছে পেলেই যত ব্যর্থতা!!
আমি ক্লান্ত তোমাকে খোঁজাই হয়
পোওয়া হয়ে ওঠে না। যাবে কী কখনো?
বিজয়, তোমাকে দেবার আর বিন্দুমাত্র বাকি নেই।
শুধু আমার অরক্ষিত ভালবাসা ছাড়া।

মধ্য রাতের আতংক

মহিউল ইসলাম (জোয়েল)
প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা

মধ্য রাতের একটি আর্ত চিৎকার
অনেক সম্ভাবনার জন্ম দেয়।
বিভিষীকাময় কোন যুদ্ধের ডামাঢোল
হঠাৎ ছুটে আসা কোন উল্কাপিণ্ড
দক্ষ যোদ্ধার বেশে ছাত্রদের মহড়া
এসিড দগ্ধ কোন যুবতীর বিপর্যস্ত আর্তনাদ
সদ্য লটারী প্রাপ্ত কোন বেকার যুবকের উন্মত্ত চিৎকার
ছাদ ধ্বসে আটকে পড়া হলবাসীর বীভৎস আহ্বান
নিহত সৈনিকের সমর যাত্রার তোপধ্বনি।
হয়তঃ একটি মৃত্যু ...পাশের বাড়ীর পাঁচটি শিশুর অবুঝ ক্রন্দন।
অথবা গর্জে উঠা মিউজিয়ামের কামান
হঠাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠে আমার একটি বাল্ব
হয়তবা তা–ও নষ্ট হয়ে গেছে অথচ অপরটি চিৎকার করে উঠে সশব্দে।

তোমার জন্যে

আবু খালেদ
প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিজয় তোমার জন্যে মায়ের বুক হয়েছে শূন্য
অপেক্ষার প্রহর গুণেছে পিপাসার্ত হৃদয়
প্রিয়ার কালোচোখে দেখেছি হতাশার ছাপ।
তোমার জন্যে রাইফেল মর্টার আর ষ্টেনগান
বুকের তাজা রক্ত নিয়ে খেলেছে হোলি উৎসব অহর্নিশ
তোমার জন্যে চিরপরিচিত একটি শব্দ রূপান্তরিত হলো প্রিয় সন্তানে
সুদীর্ঘ ন'টি মাস পর জন্ম নিলো 'স্বাধীনতা' নামের শিশুটি

ডিসেম্বর উপাখ্যান

সৈয়দ রফিক

দ্বাদশ মানবিক

ডিসেম্বর মানেই রৌদ্রতপ্তে কেঁপে উঠা তোমার পৃথিবী
ডিসেম্বর মানেই কুকুরের কবল হতে ফিরে আসা স্মৃতি
ডিসেম্বর মানেই, বারুদ ঝলসানো আগুন
ডিসেম্বর মানেই শ্লোগানের উৎসব
কবিতার জন্ম।
দশ দিগন্তে মুক্তিকামী জনতা
আজ চারিদিকে রক্তের উৎসব
আর চিতার উত্তপ্ত গর্জন
ডিসেম্বর মানেইতো বিপ্লবের উপাখ্যান।

লেলিহান সুন্দর

সেহেনা চৌধুরী

দ্বাদশ মানবিক

আমার চলার পথ কারা যেন আগলে দাঁড়ায়
ভেঙ্গে দেয় চলার গতি বিষাক্ত মাদার কাঁটায়।
অথচ আমি এক নির্ভিক যোদ্ধা
এগিয়ে চলি অবিচল
সম্ভাবনাময় পথ হেঁটে;
আমার পায়ের ক্ষিপ্রতায়
কেঁপে উঠে নষ্ট জলাভূমি।
অতএব শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হোক, সত্য ফিরে পাক প্রাণ
সত্য, চির সুন্দর–প্রমাণ হোক লেলিহান।

সকালের প্রার্থনা

কবির হোসেন

দ্বাদশ মানবিক

এখন অন্ধকার মুছে গিয়ে আলো ফুটুক
পৃথিবী, আলো আরো আলো।
অন্ধকার নয় আলোর বন্যায় সয়লাভ হোক বিজয়ের আকাশ।
মধ্যরাতের স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে ফেলি কাঁচের মতো।
চোখের সামনে নেচে উঠে একটি অনুপম সকাল,
রাত নয় ভোর হোক ভোর থেকে সকাল।
ঘুমন্ত মানুষেরা,
জেগে উঠো, বলো, আমরাতো চাই একটি অনুপম সকাল
পবিত্র সুন্দর, পাখি ডাকা আলোময় দিন।

ডিসেম্বর তুমি

এম,এ, আবিদ

দ্বাদশ মানবিক

ডিসেম্বর তুমি শহীদের রক্তে ভেজা ঘোল
ডিসেম্বর তুমি ভোরের ফেরারী সুর্য
ডিসেম্বর তুমি বাংলার সংস্কৃতি কবিতার ছন্দ।
ডিসেম্বর তুমি বাঙালীর সোনালী সুন্দর ইতিহাস
সূর্যরোদ্দুর আকাশ
বাতাসে কেঁপে থাকা লাল সবুজ রঙ।

দু'টি ছড়া

আরজ আলী
দ্বাদশ মানবিক

এক

সাগর সাগর রক্ত দিয়ে
বুকের তাজা খুন এড়িয়ে,
আনলো যারা স্বাধীনতা
বলছি আমি তাদের কথা।

দুই

বুক ফুলিয়ে মায়ের ছেলে
করলো সেদিন যুদ্ধ যারা,
পাক্ সেনাদের মারতে গিয়ে
হয়েছিলো ক্ষুব্ধ তারা।
শহীদ ছেলের মা যে হলো
ছেলের জন্যে কাতর কাঁপা
শোকে শোকে মায়ের বুকে
পড়লো যে আজ পাথরচাপা।

বিজয়ের ছড়া

ছাহেরা খানম
দ্বাদশ মানবিক

বিজয় আজ শুধু বইয়ের পাতায়,
বিজয় আজ শুধু রূপালী পর্দায়।
বিজয় আজ শুধু সবুজ পতাকায়,
বিজয় আজ শুধু কবির কল্পনায়।
বিজয় আজ শুধু গানে আর সুরে,
বিজয় আজ শুধু পোষ্টারে পোষ্টারে।
বিজয় আজ শুধু রূপকাহিনী গাঁথা,
বিজয় আজ শুধু কাগজের পাতা।
বিজয় আজ শুধু স্মৃতি বহ বাগান,
বিজয় যেনো আজ কেঁদে উঠা প্রাণ।

সংক্ষিপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর
ছাতক, সুনামগঞ্জ।

গ্রন্থনা ঃ মোঃ মিছবা উদ্দিন
প্রভাষক গণিত
সহযোগিতায় ঃ মোস্তাবুর রহমান
সহকারী হিসাব রক্ষক

- ❑ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক প্রথম অনুমতি প্রদান ঃ ১৪/১০/১৯৯৪ইং
- ❑ একই শিক্ষাবোর্ড কতৃর্ক একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান ঃ ২৬/৯/১৯৯৫ইং
- ❑ প্রথম শিক্ষাবর্ষ ঃ ১৯৯৪-৯৫ইং
- ❑ মানবিক বিভাগের অনুমতি লাভ ঃ ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
- ❑ বাণিজ্য বিভাগের অনুমতি লাভ ঃ ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
- ❑ বিজ্ঞান বিভাগের অনুমতি লাভ ঃ ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
- ❑ পাঠদানের বিভিন্ন বিষয় সমুহ ঃ

(১) বাংলা (২) ইংরেজী

মানবিকঃ (৩) পৌরনীতি (৪) অর্থনীতি (৫) সমাজ বিজ্ঞান (৬) ইতিহাস (৭) ইসলামের ইতিহাস (৮) যুক্তি বিদ্যা (৯) গনিত।

বাণিজ্যঃ (১০) বাণিজ্যনীতি (১১) হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞাণ (১২) অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভুগোল

বিজ্ঞানঃ (১৩) পদার্থ বিদ্যা (১৪) রসায়ন বিদ্যা (১৫) জীববিদ্যা (১৬) গনিত।

পাঠসহায়ক নিয়মিত কার্যক্রম

❑ খেলা ধুলা ❑ সংগীত চর্চা ❑ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ❑ সেমিনার ❑ বক্তব্য উপস্থাপন ও দলীয় আলোচনা ❑ শিক্ষা সফর ❑ বনভোজন ❑ নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা ❑ জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন ❑ বার্ষিকী ও অন্যান্য প্রকাশনা।

- ❑ অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আখলাকুর রহমান
- ❑ অধ্যাপনায় নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ

(১) জনাব মোঃ মিছবা উদ্দিন (২) জনাব মোঃ আখলাকুজ্জামান বাবুল (৩) জনাব মোঃ মহিউল ইসলাম জুয়েল (৪) জনাব আবু খালেদ (৫) জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী

CamScanner

(৬) জনাব মোঃ সাদেকুর রহমান খাঁন (৭) জনাব মোঃ জহিরুল হক (৮) জনাব হেলাল আ-হমদ চৌধুরী (৯) জনাব মোঃ আশফাকুর রহমান (১০) জনাব তোফায়েল আহমদ (১১) শ্রী পবিত্র কুমার দেব (১২) জনাব শামীম আখতার চৌধুরী (১৩) শ্রী চম্পক রঞ্জন তালুকদার।

❑ অফিস সহকারী ও অন্যান্য কর্মকারীবৃন্দঃ

(১) মোঃ মোস্তাবুর রহমান সহকারী হিসাব রক্ষক (২) মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন-অফিস সহকারী (খন্ডকালীন) (৩) ফয়সল আহমদ-পিয়ন (৪) শ্রী নৃপেন্দ্র ধর-নইটগার্ড (৫) শ্রী মতি শুক্লা রাণী ধর-আয়া।

❑ একাডেমী কাউন্সিল ঃ

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ আখলাকুর রহমান, অধ্যক্ষ

সদস্য সচিব ঃ জনাব আখলাকুজ্জামান বাবলু

সদস্যবৃন্দ ঃ সকল অধ্যাপক, প্রদর্শক এবং অফিস সহকারীর মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীবৃন্দ।

❑ একাডেমিক উপপরিষদ সমুহঃ

❑ ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃংখলা উপপরিষদ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-জনাব আখলাকুজ্জামান বাবলু

❑ পাঠাগার, প্রচার ও প্রকাশনা উপপরিষদ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব হেলাল আহমদ চৌধুরী

❑ সাহিত্য ও সংস্কৃতি উপপরিষদ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব তোফায়েল আহমদ

❑ ভর্তি, নিবন্ধন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ উপপরিষদঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মহিউল ইসলাম

❑ ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ উপপরিষদ ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ জনাব মোঃ মিছবাউদ্দিন

❑ জনসংযোগ, উন্নয়ন ও তহবিল উপপরিষদ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ জনাব মোঃ জহিরুল হক

❑ পরিবেশ ও বিজ্ঞানাগার সংরক্ষণ উপপরিষদ ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ শ্রী পবিত্র কুমার দেব

❑ ক্রীড়া ও শরীর চর্চা বিষয়ক উপপরিষদ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ জনাব আবু খালেদ

❑ প্রশাসনিক বর্হিযোগাযোগ বিষয়ক উপপরিষদ ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ জনাব সাদেকুর রহমান খাঁন

❑ হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষণ উপপরিষদ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ঃ শ্রী চম্পক রঞ্জন তালুকদার

❑ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ঃ

২০০ ফুট লম্বা ৩৪ ফুট প্রস্ত এবং ৮ কক্ষ বিশিষ্ট সুপরিসর একাডেমিক ভবন। ৪০X৪৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট বিজ্ঞান ভবন। ২০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট শিক্ষক কর্মচারীর জন্যে আকর্ষণীয় ডরমেটরী ও সুপ্রশস্ত খেলার মাঠ। অতিরিক্ত সুবিধা ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ফ্রি থাকা খাওয়ার সুবিধা এবং মেধাবীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ।

CamScanner

ভালো লাগা অনুভূতি নিয়ে দু'টো কথা

আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওহাব

সভাপতি

জনতা মহাবিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি

যুক্তরাজ্য শাখা।

ভালো লাগছে এই ভেবে যে, জনতা মহাবিদ্যালয় এর সুপ্রিয় একদল উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কোলাহলে মাতিয়ে রেখেছেন মঈনপুরের শ্যামল ও নির্জন প্রান্তর।

এমন একটা সমাগমই আমাদের কাম্য ছিলো। যেখানে উন্নয়নের মূলমন্ত্র শিক্ষার অনুশীলন এবং এর পাশাপাশি পরিশীলিত সুকুমার বৃত্তির ছোয়ায় আমাদের এ পশ্চাদপদ এলাকা সতেজ হয়ে উঠবে। এর প্রায় নিষ্প্রাণ অবয়বে জীবনমূখী সংস্কৃতির আবহ সৃষ্টি হবে। আমরা এ-ই চেয়েছিলাম।

আমরা জীবন সংগ্রামের পথ-পরিক্রমায় দেশ থেকে বহুদূরে-সুদূর যুক্তরাজ্যে আছি। তবু আমাদের আপন মাটি ও মানুষের টান আমরা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করি। অন্তর থেকে কামনা করি এদের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন। আর এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই সময় ও সুযোগের এক সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগে আমরা নিজেদের সম্পৃক্ত করেছি।

জনতা মহাবিদ্যালয় আমাদের সকল প্রাবসীদের আশা আক্ষঙার বিমূর্ত প্রতীক। এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও বেড়ে উঠার পথকে নির্বিঘ্ন করার প্রয়োজনে যতটা সম্ভব তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা সকলে। আমরা চাই এ প্রতিষ্ঠানটি পৌনপৌণিক গতিময়তা লাভ করুক। একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াসে রূপান্তরিত হোক। আমাদের সুপ্ত আকাঙ্খা সমুদ্রোচ্ছাস তুল্য আনন্দের প্লাবণ সৃষ্টি করুক। আমাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম ও প্রিয়সন্তানেরা যেনো সুযোগ্য উত্তরাধিকার অর্জনের সুযোগ লাভে সমর্থ হয়।

দেশে যারা আছেন, আত্মার সম্পর্কের দাবী নিয়েই সকলকে বলবো, জনতা মহাবিদ্যালয় আমাদের সকলের হৃদয়স্নাত ভালোবাসার ফসল। একে লালন পালনের মূল দায়িত্ব আপনাদের। প্রয়োজনীয় অর্থের সিংহভাগ যোগানের দায়িত্ব আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি। এজন্যে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ও অব্যাহত রাখবে। একে গড়ে তুলবেন আপনারা আর সযত্নে আগলে রাখবেন বুকে।

সুপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ও স্নেহভাজন শিক্ষকবৃন্দের জন্যে রইলো অফুরন্ত শুভাশীষ। জনতা মহাবিদ্যালয়কে একটা দৃষ্টান্তমূখী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ।টানে রূপান্তরের লক্ষ্যে আপনারা আপনাদের সকল মেধা ও শ্রম দিয়ে সাহসী সৈনিক দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। দায়িত্ব আপনাদেরই বেশী। শক্তি ও সাহস নিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে আপনারা এগিয়ে যান। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

তারিখ : লণ্ডন-৫ ডিসেম্বর '৯৬ইং

✓আমরা যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

❑ গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা ও এর সকল উপকমিটি

❑ জনতা মহাবিদ্যালয় মঈনপুর বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখা

❑ ছাতক দোয়ারা প্রবাসী (CDP) এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিমিটেড

❑ সংশ্লিষ্ট থানা, জেলা ও শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

❑ জনতা মহাবিদ্যালয় পরিবার

✓ আমরা আরো যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

❑ কবিতা
কাজলশাহ, সিলেট।

❑ নিলুফা নাসরিন আহমদ
এবি ব্যাংক, মধুবন শাখা, সিলেট

❑ মণিকা দেবনাথ
এবি ব্যাংক, মধুবন শাখা, সিলেট

❑ মোঃ কয়ছর আহমদ
গ্রামঃ পালপুর, দুলারবাজার, ছাতক।

❑ আব্দুল কাইউম
গ্রামঃ পালপুর, দুলারবাজার, ছাতক।

☞ স্বল্পসময়ে জনতা মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রম সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। আমার এর ধারাবিহকতা, সেই সাথে বিজয় রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনা '৯৬ এর সমৃদ্ধি কামনা করি-

❑ হাজী মোঃ আফরোজ মিয়া
সহসভাপতি, পরিচালনা কমিটি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

❑ একরাম উদ্দিন আহমদ
সদস্য, পরিচালনা কমিটি, জনতা মহাবিদ্যালয়।
ও মহাসচিব, গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা।

❑ হাজী মোঃ ওয়ারিছ আলী
সদস্য, পরিচালনা কমিটি, জনতা মহাবিদ্যালয়।

❑ আব্দুল মুনিম
সদস্য, পরিচালনা কমিটি, জনতা মহাবিদ্যালয়
ও চেয়ারম্যান ১০নং দুলারবাজার ইউপি

❑ আবু নছর মোহাম্মদ অহিদ
সদস্য, পরিচালনা কমিটি, জনতা মহাবিদ্যালয়

'পদক্ষেপ' বিজয় রজত-জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনা প্রাক্কালে জনতা মহাবিদ্যালয়ের অব্যাহত সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায়-

মোঃ নাছিম হোসেন

গ্রাম/ডাক/ইউপি ঃ ভাতগাও
ছাতক, সুনামগঞ্জ

পদক্ষেপ এই শেষ নয়
বিজয়-রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনা '৯৬
উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করুক-এই কামনায়

খলকুর রহমান

বেগম খলকুর রহমান

১৩ ঝর্ণারপার. কুমারপাড়া, সিলেট-৩১০০

জনতা মহাবিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত

আব্দুর রঊফ

গ্রাম ঃ রুকুনতাজ, আলীগঞ্জবাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

'পদক্ষেপ' এর উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক- এ কামনায়

জালালাবাদ পেট্রোল পাম্প

ডিলার ঃ যমুনা অয়েল কোং লিঃ
সিলেট-সুনামগঞ্জ রোড
আম্বরখানা, সিলেট।

'পদক্ষেপ' বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনা '৯৬কে সুস্বাগতম
আসবাবসামগ্রীর প্রস্তুত ও সরবরাহে দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ
সেবা, আপনার পরিবেশকে করে তুলবে আরো আকর্ষণীয়

মেসার্স ইউনিক ফার্নিচার

সুনামগঞ্জ রোড, আম্বরখানা, সিলেট-৩১০০
✆ ৭১৩৬৯৫

বিজয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে জনতা মহাবিদ্যালয়ের
অগ্রগতি কামনা করছি

চৌধুরী মুশতাক আহমদ

আর্কিটেক্ট
ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্সী সার্ভিসেস
সেঞ্চুরী শপিং সেন্টার, আম্বরখানা, সিলেট।

জনতা মহাবিদ্যালয় মঙ্গলপুর, সময়ের একটি বাস্তব পদক্ষেপ
বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনার প্রাক্কালে ক্রমাগত
এর সমৃদ্ধি কামনা করছি-

সানড্রে প্যালেস

মেডিকেল কলেজ রোড, কাজলশাহ, সিলেট
প্রোঃ এম এ ওয়াহিদ

বিজয় রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনার প্রাক্কালে জনতা
মহাবিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা কামনায়

দি ষ্টার ফার্মেসী

জিন্দাবাজার, সিলেট।
© ৭১৮১০১

গ্রামীন জনপদে শিক্ষা সম্প্রসারণে জনতা কলেজ-মঙ্গলপুর, সময়ের এক সাহসী সংযোজন
বিজয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পদক্ষেপ-এর দ্বিতীয় অবয়বের প্রকাশে আমরা বিমুগ্ধ
মেসার্স মুক্তা জুয়েলার্স

(অলংকার জগতের মানসম্মত সাজ ও আস্থার এক অপ্রতিদ্বন্দ্বি নাম)

মেসার্স মুক্তা জুয়েলার্স

মনসুর চেম্বার, বন্দর বাজার, সিলেট-৩১০০ © ৭১২১৩৭
প্রোঃ হাজী মোঃ সুনু মিয়া

বিজয়ের রজত জয়ন্তীতে পদক্ষেপ এর স্মারক প্রকাশনা '৯৬কে
আমরা অনুপম সুন্দর অভিনন্দন জানাচ্ছি
সর্বপ্রকার স্টীল সামগ্রী, গ্রীল, সাটারিং
ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

খাঁন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্

৯৫ মধু শহীদ
ভাতালিয়া রোড, সিলেট
প্রোঃ গুলজার খাঁন

CamScanner

পদক্ষেপ বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনাকে সুস্বাগতম

দেশী-বিদেশী বাছাই করা উন্নতমানের স্যানিটারী সামগ্রীর এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সুরমা এন্টারপ্রাইজ

এয়ারপোর্ট রোড
দরগা গেইট
সিলেট-৩১০০
✆ ৭১৪০৩০

ফাজিল চিস্ত
পূর্ব সুবিদাবাজার
সুনামগঞ্জ রোড, সিলেট-৩১০০
✆ ৭১২৭৫৯, ৭১৭২৬১

জনতা মহাবিদ্যালয়, মঈনপুর-এর সফল
অগ্রযাত্রায় আমরা গর্বিত

এরই ধারাবাহিকতায় ‘পদক্ষেপ’ বিজয়ের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রকাশনাকে
আমাদের আন্তরিক অভিবাদন

আপনার বিদেশ ভ্রমণের সকল ঝক্কি ঝামেলা আমাদের উপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিন।
সুখময় বিদেশ ভ্রমণের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আমরা খুবই আন্তরিক।

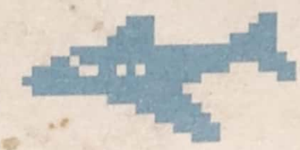

মেসার্স প্রান্তিক ট্রেভেলস

(আই, এ, টি, এ অনুমোদিত)
৮/৯ করিমা ম্যানশন
পূর্ব দরগা গেইট, সিলেট-৩১০০
অফিস : ৭১৪১৮০
বাসা : ৭১৮৭৬৩
প্রোঃ হাজী মোঃ ছাদিক মিয়া

CamScanner